Vol. 54 | No. 2 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাঈদ আহমদের নাটক : প্রথম পর্ব

Volume	54
Issue	2
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mir Humayun Kabir
Published online	February 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i2.6
Pages	১০৫-১২৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাঈদ আহমদের নাটক : প্রথম পর্ব

মীর হুমায়ূন কবীর*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের সাহিত্যে আধুনিক নাট্যধারার অন্যতম রূপকার সাঈদ আহমদ (১৯৩১-২০১০)। এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিকশিত হয়েছে তাঁর শিল্পীমানস। খুব বেশি নাটক লেখেননি তিনি। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি। তবে স্বল্পসংখ্যক নাটক রচনার মধ্য দিয়ে এদেশের সাহিত্যাঙ্গনে তিনি মুদ্রিত করেছেন স্থায়ী আসন। সাঈদ আহমদের নাট্যকর্মগুলোকে দুটি পর্বে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম পর্বের নাটকসমূহ বিভাগোত্তরকালে রচিত। এ পর্বের তিনটি নাটক : *কালবেলা* (১৯৬২), *মাইলপোস্ট* (১৯৬৫) এবং *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯)। এ নাটকগুলোতে তিনি প্রচলিত নাট্যশৈলী পরিহার করে এদেশের শিল্পাঙ্গনে প্রথমবারের মতো অ্যাবসার্ড ধারার প্রচলন করেন। আঙ্গিক এবং উপস্থাপনায় পাশ্চাত্যধর্মী হলেও এ পর্যায়ের নাটকের বিষয়বস্তু সমকালীন বাংলাদেশ। ষাটের দশকের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রথম পর্বের নাটকে যেমন ভিন্ন মাত্রায় চিত্রিত হয়েছে, তেমনি লোককাহিনির আবরণে উচ্চারিত হয়েছে স্বৈরাচারী অপশক্তিকে প্রতিহত করবার ইঙ্গিত। দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলো রচিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে। এ পর্যায়ে তিনি রচনা করেন *প্রতিদিন একদিন* (১৯৭৪) এবং *শেষ নবাব* (১৯৮৯)। আলোচ্য প্রবন্ধে নিরূপিত হবে সাঈদ আহমদের প্রথম পর্বের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য এবং শিল্পসৌন্দর্য।

বাংলাদেশের নাটকে সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) অবস্থান স্বতন্ত্র। সমকালীন জনপ্রিয় সামাজিক নাট্যধারার বিপরীতে তিনি এদেশের নাট্যাঙ্গনে প্রবর্তন করেন অ্যাবসার্ড শিল্পরীতির। 'পঞ্চাশের দশকে ইউরোপীয় সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী (Existentialism) এবং অধিবাস্তববাদী (Absurd) ভাবধারার যে প্রকাশ ঘটছিল, তার সঙ্গে এতদঞ্চলের, এক রকম বলতে গেলে প্রথম পরিচয় ঘটে, ১৯৬২ সনে মঞ্চস্থ সাঈদ আহমদের *কালবেলা* নাটকের মাধ্যমে।' (সাঈদ, ১৯৭৬ : ভূমিকা) এ প্রসঙ্গে নাট্যকারের ভাষ্য হচ্ছে– 'আমি বাংলাভাষার প্রথম নাট্যকার যিনি অ্যাবসার্ডধর্মী

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।

নাটক লিখেছি। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে নাটকের ক্ষেত্রে আলাদা ধারার সৃষ্টি করেছি।' (হাসনাত, ২০১২ : ৫৫৮) সাঈদ আহমদ মূলত একজন আন্তর্জাতিকমনস্ক নাট্যশিল্পী। ১৯৫৪ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি আধুনিক থিয়েটারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন। পরবর্তীকালে সরকারি চাকরিসূত্রে তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং পৃথিবীর প্রখ্যাত নাট্যকার, অভিনেতা এবং পরিচালকের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তবে তাঁর শিল্পীসত্তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে অ্যাবসার্ড নাটকের অন্যতম দুই পুরোধাপুরুষ স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬-১৯৮৯) এবং ইউজিন ইউনেস্কো[১] (১৯০৯-১৯৯৪)। তাঁদের 'নাটকের অস্বাভাবিক কাহিনী, প্লটের অভাব অথবা উচ্ছৃঙ্খল গঠন, সংলাপের সংক্ষিপ্ততা ছিল আকর্ষণ করবার বাইরের দিক। এদের ভেতরে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আধুনিক ব্যক্তিমানুষের অস্থিরতা, ক্ষ্যাপামি, বেপরোয়া মানসিকতা, কৌতুক ও হাস্যবোধ এবং সর্বোপরি বুদ্ধির উজ্জ্বল ঝলক।' (হাসনাত, ২০১২ : ১১) এঁদের অ্যাবসার্ড চিন্তাধারা এবং শিল্পপ্রকৌশলের সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে সাঈদ আহমদের বিভাগোত্তরকালের নাটকে। এ পর্যায়ে রচিত নাটকগুলো হলো : *কালবেলা* (১৯৬২), *মাইলপোস্ট* (১৯৬৫) এবং *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯)।

এক

বিশ্ব নাট্যসাহিত্যের একটি আধুনিক সংযোজন অ্যাবসার্ড নাটক। এ ধারার নাট্যকাররা বিষয় এবং প্রকরণ উভয় ক্ষেত্রে স্বাধীনচেতা এবং কাহিনিবয়নে কোনোরূপ যৌক্তিক পরম্পরায় আস্থাশীল নন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বিরাজিত সমস্যা ও সংকট, ধনতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর ভয়াবহ আগ্রাসন, মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং সর্বোপরি মানবজাতির তীব্র অস্তিত্বসংকটের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো সাহিত্যিক অ্যাবসার্ড-কৌশলে শিল্পচর্চা শুরু করেন। ১৯৪২ সালে আলবেয়ার ক্যামু (১৯১৩-১৯৬০) তাঁর *The Myth of Sisyphus* গ্রন্থে প্রথম অ্যাবসার্ডিটির লক্ষণ নিরূপণ করেন এবং একে একটি দার্শনিক প্রত্যয়ে উপনীত করেন। এ গ্রন্থে তিনি বলেন–

> A world that can be explained by reasoning however faulty, is a familiar world. But in a universe that is suddenly deprived of illusions and of light, man feel a stranger. He is an irremediable exile, because he is deprived of memories of a lost homeland as much as he lacks the hope of a promised land to come. This divorce between man and his life, the actor and his setting truly constitutes the feeling of a Absurdity. (সমীরণ, ১৯৯৬ : ১৩-১৪)

১৯৫৩ সালে স্যামুয়েল বেকেটের *ওয়েটিং ফর গোডো*–র (১৯৫২) মঞ্চায়নের পর অ্যাবসার্ড নাটক সম্পর্কে আগ্রহী হন বিশ্বের বিদগ্ধ নাট্যশিল্পী এবং দর্শকবৃন্দ। এ

নাটকে দুজন ভবঘুরে ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগন অপেক্ষা করে গোডোর জন্য। গোডো আসে না, কিন্তু শেষ হয় না তাদের অনন্ত প্রতীক্ষা। ভ্লাডিমির এবং এস্ট্রাগনের আশা-বেদনাকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকটির প্রথম পর্যায়ের প্রদর্শনী শুধু প্যারিসেই চারশ রজনী অতিক্রম করে। অন্তত বাইশটি দেশের স্বনামধন্য থিয়েটারে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় এবং কুড়িটিরও বেশি ভাষায় এটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে মার্টিন এসলিন (১৯১৮-২০০২) *The Theatre of the Absurd* (১৯৬১) গ্রন্থে অ্যাবসার্ড-আদর্শের বিশদ পরিচয় উপস্থাপন করেন। আলবেয়ার কামুর বক্তব্যের সূত্রানুসারে তিনি বলেন :

> TheTheatre of the Absurd express the anxiety and despair that spring from the recognition that man is surrounded by areas of impenetrable darkness, that he can never know his true nature and purpose, and that no one will provide him with ready-made rules of conduct. As Camus says in *The Myth of Sisyphus*. (Martin, 1961 : 414)

মার্টিন এসলিন *The Theatre of the Absurd* গ্রন্থে অ্যাবসার্ড নাটকের চার প্রধান প্রবক্তা হিসেবে উল্লেখ করেন স্যামুয়েল বেকেট, আর্থার এ্যাডামোভ, ইউজিন ইউনেস্কো এবং জাঁ জেন্যের নাম। এঁরা সকলেই ছিলেন প্যারিসবাসী, যদিও বেকেট জাতিতে আইরিশ, এ্যাডামোভ রুশীয় এবং ইউনেস্কো ছিলেন রুমানীয়। অ্যাবসার্ড নাটকের বিকাশস্থল ফ্রান্স হলেও এ নাট্যশৈলী বিশ্বসাহিত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'সুসংহত নিয়মবদ্ধ নাটক, যাকে পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে Well made play, তারই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম ফসল অ্যাবসার্ড বা উদ্ভট নাট্য।' (কুন্তল, ২০০১ : ৯৩) কোনো নতুন তত্ত্ব কিংবা মূল্যবোধের প্রচার নয়, বরং স্বপ্নময়তার সঙ্গে বাস্তবতার এক আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে এ শ্রেণির শিল্পকলায়। প্রথাগত নাট্যশাস্ত্রের বিপরীতে অ্যাবসার্ড নাটক প্রধানত ভাবাশ্রয়ী। এর ফলে নাটকে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয় প্রতীকীভাবে। অ্যাবসার্ড নাট্যকাররা প্রচলিত প্লট, প্রথাসিদ্ধ গল্প কিংবা চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটাননি। এঁদের নাটকের পটভূমি, স্থান, কাল, চরিত্র সবই রহস্যমণ্ডিত। চরিত্রগুলোর কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় নাটকে পরিস্ফুটিত হয় না, বরং তারা সমগ্র নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব এবং নির্বাসিত মানবজাতির প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের উচ্চারিত সংলাপও বাস্তবতাবর্জিত। নাট্যশিল্পী আতাউর রহমান অ্যাবসার্ড নাটকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ প্রসঙ্গে বলেছেন–'এ শ্রেণীর নাটক কবিতার খুব কাছাকাছি। এ নাটক বৈদগ্ধ্যপূর্ণ কোন সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে না। আবার জ্ঞান দানও করে না। দেখা গেছে বেশিরভাগ অ্যাবসার্ড নাটকই বৃত্তাকার গাঁথুনিতে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ যেভাবে শুরু হয়েছে ঠিক সেভাবে শেষ হয়েছে।' (রামেন্দু, ২০০৭ : ৩৫৪) বাংলাদেশের একাধিক নাটকে

অ্যাবসার্ড আঙ্গিকের অভিঘাত লক্ষ করা যায়। এতৎপ্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৪-১৯৭১) *কবর* (১৯৫৩), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) *তরঙ্গভঙ্গ* (১৯৬২), *উজানে মৃত্যু* (১৯৬৩) এবং সাঈদ আহমদের *কালবেলা* (১৯৬২), *মাইলপোস্ট* (১৯৬৫), *তৃষ্ণায়* (১৯৬৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দুই

অ্যাবসার্ড ভাবধারায় রচিত বাংলাদেশের প্রথম নাটক সাঈদ আহমদের *কালবেলা*[২]। বিশ্ব নাট্যমঞ্চে বাংলা নাটকের প্রতিনিধিত্বশীল শিল্পকর্ম এটি। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর মতে – 'বাস্তববাদী নাটকের প্রকরণকে বর্জন করে নাট্যকার এখানে পাশ্চাত্যের এ্যাবসার্ড নাটকের আঙ্গিকে ঘটনাবিহীন, অসংলগ্ন সংলাপনির্ভর, অস্তিত্ববাদী দর্শনাশ্রয়ী এমন একটি নতুন ধরনের নাটক বাঙালি দর্শক-পাঠককে উপহার দিলেন যা অনিবার্যভাবে স্যামুয়েল বেকেটের নাটক, বিশেষ ভাবে তাঁর *ওয়েটিং ফর গোডো*–র কথা মনে করিয়ে দেয়।' (কবীর, ১৩৯৩ : ২) কোনো বিশেষ ব্যক্তিচরিত্র এ নাটকের নায়ক নয়, নায়ক হচ্ছে প্রকৃতি। '১৯৬১ সালের (৯ মে) ঘণ্টায় ১৬১ কিমি বায়ুপ্রবাহ ও ২.৪৪-৩.০৫ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় বাগেরহাট ও খুলনা সদরের উপর দিয়ে বয়ে যায়। নোয়াখালী-হরিনারায়নপুরের রেলযোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং চর আলেকজান্ডারে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে। মোট ১১,৪৬৮ জনের মৃত্যু এবং প্রায় ২৫,০০০ গবাদিপশু ধ্বংস হয়।' (সিরাজুল, ২০১১ : ১৬৮) ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবকালে চর আলেকজান্ডারের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তীব্র অসহায়তা এবং দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে এ নাটকে। সাঈদ আহমদ নিজেও বলেছেন – 'আমার *কালবেলা* নাটকটি ১৯৬১ সালের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পটভূমিকায় রচিত।' (সাঈদ, ১৯৭৬ : ভূমিকা) ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুযোর্গের সম্ভাবনায় মানুষ হয়ে পড়ে অনুভূতিশূন্য। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও তা উপেক্ষা করতে না পারার হৃদয়যন্ত্রণায় তাদের আচরণ হয় উদ্ভট, বক্তব্য হয় অসংলগ্ন; উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় স্পষ্ট হয় তাদের চিত্তবৈকল্য। নাটকে জীবনসত্যের এ রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। *কালবেলায়* নাটকীয় উৎকণ্ঠা থাকলেও, নেই কোনো চরিত্রের বিকাশ কিংবা পরিণতি। কারণ 'অ্যাবসার্ড নাটকের জগৎ জড়, নিষ্ক্রিয়, হতোদ্যম মানুষের জগৎ, –বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে যারা জন্মসূত্রেই অভিশপ্ত, কোণঠাসা আর হতাশ; অস্তিত্বের জটিল ঘূর্ণাবর্তে যারা কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো উদ্ভ্রান্ত এবং অসহায়।' (সমীরণ, ১৯৯৬ : ৯) *কালবেলা* নাটকে তাই একাধিক চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও তারা নাট্যকাহিনিকে পরিচালিত করেনি, বরং ঘটনাপ্রবাহের নিয়ন্ত্রক সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়ের আগমনবার্তা। নাটকের ভূমিকাংশে নাট্য-নির্দেশক বজলুল করিম (১৯৩২-১৯৭৭) জানিয়েছেন –

> ১৯৬১ সনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম অঞ্চলে গোর্কির ভয়াবহ পরিস্থিতির পটভূমিকায়, একটি ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসী একদল অতীত সমৃদ্ধ মানুষের চেতনার

> বিহবল প্রকাশ ঘটানো হয়েছে এই নাটকটিতে। তাদের অতীতকে তারা উদ্ধার করে আনতে চায় বর্তমানের বিন্দুতে, অভিজ্ঞতার, চেতনার আলোকে ভবিষ্যতের দিকে তারা মেলতে চায় দৃষ্টি। ঘূর্ণিবাত্যা, তার আগমন-সঙ্কেত জানায়। তারা অপেক্ষা করে যায়, সময় কাটিয়ে যায়। গোর্কির প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবে এক সময়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় মানুষ, দ্বীপ, সবকিছু। তবু চেতনার যে রেশ তারা রেখে যায়, তার মাঝে ভেসে বেড়ায় আদি বিস্ময়মাখা নানা টুকরো গীতিময় ছবি, আপাতবিচ্ছিন্ন কথার ঊর্ণাজালে জীবনের সুন্দর গৌরবময় প্রতিচ্ছায়া, ব্যাপ্ত করে বোধের দিগন্তকে। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অপেক্ষায় ভ্রুক্ষেপহীনভাবে জীবনকালের কথায় আর কেলিতে সময় কাটিয়ে দিয়ে তারা মরণেরই মৃত্যু ঘটায়। (সাঈদ, ১৯৭৬ : ভূমিকা)

নাটকের প্রারম্ভে মঞ্চে প্রবেশ করে চর আলেকজান্ডার গ্রামের মোড়ল, তার শৈশবের বন্ধু আহাম্মদ এবং মুনীর। এদের বাক্যালাপসূত্রে জানা যায়, সাগরপাড়ের কিছু অধিবাসী হাঙ্গর শিকারকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে বিবাদে। প্রতিফলে হাঙ্গর এবং শিকারি উভয়কে নিজগর্ভে আত্মসাৎ করে সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আত্মিক, বন্ধন জন্ম-জন্মান্তরের। বেঁচে থাকবার ক্ষেত্রে তাদের অন্যতম অবলম্বন সাগরের মাছ, হাঙ্গর প্রভৃতি। প্রতিদানস্বরূপ 'সাগর তার গর্ভে ফিরিয়ে নিতে চায় সব। কাউকে তার কোলের বাইরে দেবে না থাকতে। তাই তার অ্যাতো খেদ, অ্যাতো গর্জন।' নাটকে বিধৃত হয়েছে উপকূলবাসীর সমৃদ্ধ অতীত জীবনও। দিনমান ঘুম, রাতভর ঢাকের বাদ্য, আর গানের রাজ্যে এক সুখময় সময় অতিবাহিত করতো তারা। মেয়েদের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে মুনীর বলেছে– 'চন্দন আর রেশমের মেয়েগুলো! যে ঈশ্বরই এদের সৃষ্টি করে থাকুন, বলিহারি বলবো আমি।' মোড়লেরও ধারণা ঈশ্বর তাঁর নিজের আদলে গড়েছেন এখানকার নারীপ্রতিমা। প্রকৃতির কল্যাণে চলতি বছর দ্বীপবাসীর ফসলও ভালো হয়। একারণে ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে মেঠো মানুষদের উদ্দেশে ঢুলি প্রচার করে মোড়লের শুভবার্তা–

> ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আগামী রোববার নয়া ফসলের শুভ উৎসব পালন করিব সাব্যস্ত করিয়াছি। আর মাত্র তিনদিন বাকি। ফুলেফলে ভরা সুপ্রসন্না ধরিত্রী। প্রকৃতি এবার উন্মুক্ত ভাণ্ডার। তার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন আমাদের কর্তব্য। এই উপলক্ষে যথাযোগ্য অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইবে, ভালো সাজপোশাক পরিবে, প্রিয়জনকে পুষ্প এবং উপঢৌকনে তুষ্ট করিবে। প্রকৃতির কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। (প্রথম অঙ্ক)

ঢুলির ঘোষণার পরক্ষণেই চরাঞ্চলের সর্বপ্রধান পুরোহিত উপেং-এর বার্তা নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে উনেন। এ সংবাদের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত ছিল মোড়লসহ অন্যরা। তবে উনেন বিশেষ কোনো তথ্য পরিবেশন করতে চায় না। তার বক্তব্যসূত্রে বোঝা যায় উপেং ইতোমধ্যে চর আলেকজান্ডারের পথে যাত্রা করেছে। উপেংকে এক পলক দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে থাকে এ জনপদের নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলে; যদিও উপেং সাক্ষাৎ করতে চায় শুধু বয়স্কদের সঙ্গে। প্রথম অঙ্কের মধ্য পর্যায়ে ঘটনামঞ্চে

প্রবেশ করে বহুপ্রতীক্ষিত বৃদ্ধ উপেং। দার্শনিক ও আচারনিষ্ঠ এ পুরোহিত মানুষের প্রতিটি কর্মে প্রত্যক্ষ করে কোনো এক অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপ। যুগাদিক্রমে মন্দিরে বিনিদ্র রাত্রী জেগে সে প্রভুর সেবায় নিয়োজিত। সজ্ঞানে কখনো দুরাচার করেনি সে। তার আগমনে উপকূলবাসী ভারমুক্ত হয়। মুনীর অকপটচিত্তে উচ্চারণ করে–'এখন আমার মৃত্যুও যদি হয়, কোন খেদ থাকবে না আমার।' অতঃপর আরম্ভ হয় তাদের ধর্মোপাসনা। আরাধনার এক পর্যায়ে যজ্ঞস্থলে আত্মপ্রকাশ করে সাদা কাপড় পরিহিত অত্যন্ত সুন্দর একটি মেয়ে। পুরোহিতের মতে, মেয়েটি ত্রিকালদর্শী এবং স্বর্গীয় এক আলোকরশ্মিতে আশ্রিতা। প্রত্যক্ষগোচর হলেও সে স্পর্শের অতীত। অলৌকিক এ নারী দ্বীপাশ্রিত জনতাকে অবহিত করতে চায় তাদের অতীত জীবন। তবে ধূসর অতীত নয়, তারা জানতে চায় গৌরবদীপ্ত বর্তমান এবং আশাভরা ভবিষ্যতের বৃত্তান্ত। উপেং এসময় তাদের করে তোলে কালসচেতন –

> অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শুধু বুদ্ধি সীমাবদ্ধতা। এগুলো পৃথক করা চলে না। অতীতে যা শুনেছো, তা বর্তমানে, বর্তমানে যখন আছো মন ছুটে চলেছে ভবিষ্যতে। আর বিবেক ঘড়ির দোলকের মতো ভূত আর ভবিষ্যতের মধ্যে দুলে চলেছে। বর্তমানকে সঁপে দেওয়া হয়েছে নিয়তির হাতে। (বিরতি) বর্তমান। (বিরতি) অসাড়, অনাড়, একটি মুহূর্ত শুধু। (প্রথম অঙ্ক)

ইতোমধ্যে মেয়েটির শরীরে প্রকাশ পায় ঐশ্বরিক অস্তিত্ব। সে 'স্বর্গীয় এক অগ্নিশিখায় যুগান্তরিত হয়েছে যেন।' পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণকালে মেয়েটি হঠাৎ কেঁপে ওঠে, চিৎকার দেয় এবং কিছুক্ষণ পর শ্রান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। পুনরায় মঞ্চে ঢুলি এসে জানায়– 'অদ্য রাত্রি সাতটার মধ্যে আমরা ভীষণ এক ঘূর্ণিবার্তা আশঙ্কা করিতেছি। ঝিরিঝিরি নরম বাতাস বহিয়া আগুনের হল্কা। সাগরের কণ্ঠ হইতে নির্গত হইবে রক্তিম লাভাস্রোত। সমস্ত কিছুই ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণা।' (প্রথম অঙ্ক) পাশাপাশি উপকূল অঞ্চলের সীমাবদ্ধতা এবং সঙ্কটের কথা সে গ্রামবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাদের নৌকাগুলো পুরাতন এবং সেগুলো সকলের জন্য যথেষ্ট নয়। সাঁতার দিয়ে পার্শ্ববর্তী উপকূলে আশ্রয় নেওয়াও অসম্ভব। কারণ সমুদ্রে রয়েছে যুগ যুগ ধরে ক্ষুধার্ত হাঙরের দল এবং দ্বীপের চতুর্দিক উন্মুক্ত ও সম্পূর্ণ অরক্ষিত। ভয়ানক প্রাকৃতিক দুযোর্গে অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লাবিত, বিধ্বস্ত এবং নিমজ্জিত হবে এ চরাঞ্চল। নাটকের প্রাক পর্যায়ে প্রকৃতির প্রতি এরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে, বশ্যতা স্বীকার করে, তৎসত্ত্বেও প্রকৃতির বিরূপতা থেকে তারা রক্ষা পায় না। এমতাবস্থায় সকলেই প্রতীক্ষা করে মৃত্যুর দূতরূপী প্রলয়ঙ্করী জলপ্লাবনের। মেয়েটিও অকস্মাৎ বলে ওঠে– 'আসছে, ঐ সে আসছে। ঐ সে আসছে। আমি তোমাদের সব বলবো। ভবিষ্যতের কথা বলবো। সব বলবো। মানবতার ভবিষ্যতের কথা। (প্রথম অঙ্ক)

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতে পাওয়া যায় দুটি চরিত্র : লোকটা (শিসদার বংশীধারী) এবং দাগী। প্রতিবেশীরা শিসদার বংশীধারীকে নিষ্কর্মা বলে অবজ্ঞা করলে সে বেঁচে থাকবার শক্ত অবলম্বন আবিষ্কারের চেষ্টা করে এবং শিস বাজিয়ে তার অক্ষমতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। শিসদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চর আলেকজান্ডারের এক প্রাচীন অধিবাসীর, যে এখন দাগী আসামি। এই ব্যক্তি নির্বিবাদে অগণিত মানুষের প্রাণনাশ করেছে। এ নরঘাতকও সংবাদ পেয়েছে– 'ঘূর্ণিবাত্যা। দানবিক ক্ষুধা নিয়ে এগিয়ে আসছে সে।' এমন ভয়ার্ত পরিবেশে দাগীর নিকট শিসদার গান শুনতে চাইলে সে যজ্ঞস্থলে এসে অলৌকিক মেয়েটির নিকট সুরের মূর্ছনা দাবি করে। একাজে বাধাসৃষ্টি করে পুরোহিত, মোড়লসহ অনেকেই। তাদের প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে দাগী প্রত্যেককে হত্যা করতে চায়। একটু পরেই যাদের সম্মুখীন হতে হবে মহাবিপদে, এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তারা একযোগে মৃত্যুকামনা করে এবং মরণের মধ্য দিয়ে দুঃসহ প্রতীক্ষা-পীড়া থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। বিষাদক্লিষ্ট এই পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকাটা তাদের নিকট মূল্যহীন এবং মৃত্যুই একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বেচ্ছানুবর্তীদের হত্যা করতে চায় না দাগী। ফলে তাদের মধ্যে সূচিত হয় হতাশা, শূন্যতা এবং নৈরাশ্যের সুর। এসময় মহাপ্রলয়ের অপেক্ষায় থাকা নিরুপায় মানুষগুলো স্মরণ করে তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীতজীবন। দাগীর যেহেতু উল্লেখযোগ্য বংশগৌরব নেই, তাই নিজস্ব পরিচয়ে সে হয়ে উঠতে চায় বিশিষ্ট। তার চিন্তাধারা গভীরভাবে আলোড়িত করে পুরোহিত উপেংসহ অন্যদের :

দাগী : আমার পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়িয়েছি আমি। আমার থেকেই চারা গজাবে।

পুরোহিত : এইতো পুরুষের মতো কথা। কে জানে আমার প্রপিতামহরা হয়তো ছিলেন মুচি, মিস্ত্রি কিংবা ফেরিওয়ালা। এ সব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। আমি যা তাই আমি। এটাই খাঁটি। (দ্বিতীয় অঙ্ক)

ধীরে ধীরে কুখ্যাত দাগী তাদের নিকট পরিণত হয় দেবদূতে। জল-প্লাবনের ভায়াবহতায় এসময় প্রত্যেকের আচরণ হয়ে পড়ে অসংলগ্ন। মেয়েটি স্বেচ্ছায় অভিসারের সুরে গান গায়। দাগী এই আনন্দ-আয়োজন উপভোগ করবার জন্য ডাকতে যায় শিসদার বংশীধারীকে। তারপর দেখা যায়, মোড়লের ইচ্ছায় তারা ডাংগুলি খেলায় মত্ত। এই খেলার সূত্র ধরে ভাগ্যবিড়ম্বিতরা ফিরে পেতে চায় হারানো কৈশোর, আবিষ্কার করতে চায় পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু এবং এর অবস্থান নিরূপণে তারা লিপ্ত হয় বাদানুবাদে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা মূলত নিরাশামোচনের চেষ্টা করে। এতৎসত্ত্বেও উপকূলবাসীর চেতনাপটে বিরাজমান আতঙ্ক অপসৃত হয় না। সন্ধ্যা সাতটায় যে ঘূর্ণিঝড় দ্বীপে আঘাত হানবে, তা প্রধান পুরাহিতকেও করে তোলে শঙ্কিত। মৃত্যুভয়ে কাতর উপেং-এর মানসিক অবস্থা অনুধাবনযোগ্য–

মোড়ল : উপেং, ওঠো, ওঠো, উঠে পড়ো।

[প্রবলভাবে তাকে ঝাঁকুনি দেয়।]

পুরোহিত : অ্যাঁ...সাতটা কী বেজেই গ্যাছে?

মোড়ল : দ্যাখো, দ্যাখো কাঁপছে সে। ভয় পাইয়ে দিয়েছি আমি তাকে। লোকজনদের এখনো ভয় পাইয়ে দিতে পারি আমি। (প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ে তারা। পুরোহিত বোকা বনে যায়) এসো, খেলি। ডাকো মেয়েটিকে। একটা প্রহসনের অভিনয় করব আমরা। একেবারে উপস্থিত বুদ্ধিমতো। (দ্বিতীয় অঙ্ক)

মোড়ল দৈহিক শক্তি দিয়ে নয়, ঢোলের শব্দে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। এ সময় টুলীকে লক্ষ করে সে বলে – 'বাজাও, বাজাও ঢাক, ছিন্নভিন্ন করে, প্রবল জোরে, তাণ্ডব তালে, বাজাও। নৃশংস ঐ কাঠি দিয়ে কানের পর্দা দাও ফাটিয়ে, সমুদ্রের বুকে তোল প্রমত্ত ঢেউ। বুনো নাচ নাচবো আমরা।' (দ্বিতীয় অঙ্ক) তবে ঢাকের বাদ্য, প্রহসনের অভিনয় প্রদর্শন, শৈশবের ডাংগুলি খেলা, পুরোহিত সহযোগে অভিবন্দনা কিংবা অতীত স্মৃতিচারণের মাধ্যমে কালক্ষেপণ– কোনো কিছুই অভিশপ্ত দ্বীপবাসীকে রক্ষা করতে পারে না। ভয়াবহ জলস্রোতে প্রত্যেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষগুলো জীবনকে কতো ভালোবাসে, তা শিসদার বংশীধারীর বক্তব্যে সহজেই অনুমেয়। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মোড়লের কাছে প্রিয় পৃথিবীর উদ্দেশে সে বলে –

> না আমাদের জন্য ব্যাপারটা বড় তাড়াতাড়িই এসে গ্যালো। তোমার সে রূপকথা তুমি পারলে না বলতে, আমিও পারলাম না পুরো সুর ভাঁজতে। সবার জন্য আসবে আগামীকাল, হয়তো বা আগামী পরশু, আমাদের মতো, চকিতে, অজান্তে, কোনদিন...কোন একদিন, কোনখানে, কোন দ্বীপে, আর কোন শিসদার বংশীধারী...অন্য কোনখানে...সবখানে। অবধারিত সত্য এ । সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। সালাম, পৃথিবী সালাম। (দ্বিতীয় অঙ্ক)

কালবেলা নাটকে সাঈদ আহমদ প্রচলিত কালচেতনা অনুসরণ করেননি। ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে সময় এখানে স্থির, নিশ্চল। প্রথম অঙ্কের সময় বৃহস্পতিবার, সকাল এগারটা এবং দ্বিতীয় অঙ্কের সময়ও একই। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই উপর্যুক্ত ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে। নাট্যকারের সময় সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশিত হয়েছে মোড়লের সংলাপে। যেমন :

> ক) মোড়ল : সময় জিনিসটাই ফাঁকা। (প্রথম অঙ্ক)
>
> খ) মোড়ল : সময় তো শুধু মুখোশ। (প্রথম অঙ্ক)

অন্যদিকে সংলাপে পরিস্ফুট হয়েছে নাট্যকারের অ্যাবসার্ড বিষয় অবতারণার কৌশল। মোড়লের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি নাটকে উদ্ভট প্রসঙ্গ উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। প্রাসঙ্গিক সংলাপ স্মরণীয় :

মুনীর : সে ব্যাপারে তোমার জুড়ি নেই। এমন উদ্বেগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারো।

মোড়ল : ওটা আমার দাদার কাছ থেকে পাওয়া। অনর্গল একটানা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন কথা বলে যাওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার– মুখের আস্ত চুরুটটা পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া অবধি। আশ্চর্য ক্ষমতা, কি বল?

মুনীর : আমার ধারণা তুমি তাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছো। (প্রথম অঙ্ক)

'অ্যাবসার্ড নাটকের সংলাপ লজিক্যাল সিকোয়েন্স অনুসরণ করে না।... ইউজিন আয়োনেস্কো তাঁর নাটকে একটি বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন– তা হলো ভাষার ট্রাজেডি বা ভাষার যোগাযোগমূলক উপযোগশূন্যতা।' (গিয়াস, ২০১৫ : ১৯) *কালবেলা* নাটকেও ভাষার এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে চরিত্রসমূহ যে সংলাপ উচ্চারণ করেছে তা যোগাযোগবিরোধী। চরিত্রগুলো কখনও কখনও একই শব্দ-বাক্য বারবার উচ্চারণ করে এবং এভাবেই তাদের হতাশা-দুর্দশা, হাহাকার-বেদনা, বিচ্ছিন্নতা-বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গতা-বিপন্নতা প্রভৃতির সঙ্গে পাঠক-দর্শককে একাত্ম করে ফেলে। একটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়–

আহাম্মদ : প্রজনন বেদনাবিধুর।

মুনীর : প্রকৃতির বেলায় কোনটা।

আহাম্মদ : বেদনা না আনন্দ।

মুনীর : শুধুই খেলা, শুধুই আনন্দ।

আহাম্মদ : শুধুই ব্যথা, শুধুই বেদনা।

মোড়ল : প্রকৃতি নির্বিকার

মুনীর : কী আনন্দে, কী বেদনায়।

আহাম্মদ : বেদনায়, শুধু বেদনায়।

মুনীর : যেতে দাও।

মোড়ল : বল হে গর্দভচন্দ্র।

আহাম্মদ : বলে যাও হে বোকাচণ্ডী। (প্রথম অঙ্ক)

তিন

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত মানুষের তীব্র নিঃসহায়ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় সাঈদ আহমদের *মাইলপোস্ট*[৩] নাটক। 'প্রথম সংস্করণের ভূমিকা'য় নাট্যকার বলেছেন– 'এই নাটকের পটভূমি দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদও– এই সত্য প্রকাশের তাগিদে *মাইলপোস্ট* লেখা হয়।' (হাসনাত, ২০১২ : ৬৩১) দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে নাট্যকার যে অ্যাবসার্ড ঘটনাবলি সন্নিবেশিত

করেছেন তার ঘটনাস্থল রাজপথ এবং সময় সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত। নাটকের প্রথমে পাওয়া যায় পাজামা ও খাকি শার্ট পরিহিত এক বৃদ্ধ চৌকিদারকে। পথিক, দূরত্ব এবং মাইলপোস্ট নিয়েই তার 'কারবার'। রাত যত মধুর হোক কিংবা বৃষ্টিঝরা-ঠাণ্ডা-অন্ধকার হোক সে অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করে ক্লান্তিহীনভাবে। চৌকিদার মনে করে সে হলো জীবাত্মার পাহারাদার। প্রথাগত জীবনযাপনে অভ্যস্ত থাকলেও দুর্ভিক্ষের দুর্দশাপন্ন পরিস্থিতিতে তার হাসির অন্তরালে অশ্রু নিঃসৃত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সে জীবনের রূপান্তর প্রার্থনা করে এবং অকারণে মাইলপোস্টের দিক নির্দেশকারী নামফলকগুলো ইচ্ছামতো পরিবর্তন করে। মাইলপোস্ট জড় পদার্থ হলেও এটিই নাটকের নিয়ন্ত্রক শক্তি; একে কেন্দ্র করে আবর্তিত চরিত্রগুলো আসন্ন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় জীবন-মৃত্যু, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে দোদুল্যমান থাকে। একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাবসার্ড নাটক চরিত্রপ্রধান নয়। এ নাটকেও উপস্থাপিত চরিত্রগুলো আদর্শ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে না; তাদের প্রত্যেকের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খণ্ডিত, আবেগতাড়িত এবং বাস্তবতা-বিবর্জিত। কর্মনিষ্ঠ প্রহরীর সঙ্গে রাজপথে দেখা হয় জনৈক গোরখোদকের। অপরিচিত এ ব্যক্তিকে সে কর্তব্যবশত তল্লাশী করতে চায়। এসময় উভয়ের কথোপকথনে উৎকীর্ণ হয় দুর্ভিক্ষের ভয়ালচিত্র:

চৌকিদার : তোমার বস্তার মধ্যে কি আছে?

গোরখোদক : খাবার জিনিস।

চৌকিদার : হতেই পারে না, আমি জানি ওটা এখন দুষ্প্রাপ্য।

গোরখোদক : তিনটে আন্দাজ করার সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি।

চৌকিদার : ছেঁড়া কম্বল।

গোরখোদক : উঁহু।

চৌকিদার : শুকনো পাতা।

গোরখোদক : উঁহু।

চৌকিদার : হ্যাঁ, একটি মেয়েমানুষ।

গোরখোদক : হলো না। ওহে জোলা পণ্ডিত, ওসব কিছু না, হাড়, হাড়, অনেকগুলো শুকনো খটখটে হাড়...হাড়, মানুষের হাড়, মাথার খুলি, পাঁজরার হাড়্ডি, হাতের আঙুল। (প্রথম দৃশ্য)

সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসে মানব অস্তিত্বের বিপর্যয়ের চিত্র এটি। কোনো বিশেষকালের দুর্ভিক্ষের রূপায়ণ নাট্যকারের অভিষ্ট ছিল না। অবহেলিত পূর্ববাংলায় শাসকবর্গের অবহেলা এবং দুঃশাসনের কারণে যে মন্বন্তর অনিবার্য ছিল এবং হয়ে উঠেছিল সর্বগ্রাসী – তার বিরুদ্ধে সাঈদ আহমদ প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাংলা ভূখণ্ডে দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি তাঁর কতটা 'অসহ্য' ছিল, তা প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রথম দৃশ্যেই :

চৌকিদার : সত্যি করে বল দেখি এটা কি নতুন দুর্ভিক্ষ ? নাকি পুরোনোটাই ঘুরে ঘুরে আসছে।

গোরখাদক : এর আবার নতুন-পুরোনো কী ? আগেও ছিল, এখনও আছে, বলা যায় সর্বকালীন। বল দেখি, কখন তুমি এর কথা শোননি ? চোখ খুলে দেখেছো সে আছে, চোখ বন্ধ করেও দেখেছো সে আছে। ক্ষুধার্ত শয়তান সবকিছু গ্রাস করেছে। অসহ্য। (প্রথম দৃশ্য)

একদিকে অনাহারী মানুষের আর্তনাদ এবং হাহাকার, অন্যদিকে 'কালো কালো কাকগুলো রাজপথে পরিত্যক্ত পচা লাশ ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।' পূর্বের আকালের বেদনা বিস্মৃত না হতেই তা আবার ছুটে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। দুটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যেখানে ধরা পড়েছে দুভিক্ষের হিংস্রতা:

ক) গোরখোদক : অসীম তৃষ্ণা নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ, অন্তহীন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। আকণ্ঠ পান করেও তার পিপাসা মিটছে না। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষকে গিলে ফেলছে সে। শত শত গ্রাম গোরস্তানে পরিণত হচ্ছে। গ্রামের পথে আজ আর কেউ হাঁটে না। একটি পাতাও নড়ে না। দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে মানুষ প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ওদের ছাড়বে না, ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে তার গতি। গত রাত্রে কয়েক মাইল দূরে ছিল, আজ সকালে হয়তো তোমার পাশের দরজায় ঘা মারছে। (প্রথম দৃশ্য)

খ) চৌকিদার : দুর্ভিক্ষ ঘাসের কচি শিষটি পর্যন্ত খেয়ে নিঃশেষ করেছে। গায়ের চামড়া টানটান হয়ে ঢোলের মতো হয়ে গিয়েছে। ফোস্কাপড়া গরমে সব পুড়ে দগ্‌দগে ঘায়ের জন্ম দিয়েছে। এ অবস্থার মধ্যে মানুষ আর মানুষ থাকতে পারে না। (প্রথম দৃশ্য)

মাইলপোস্ট নাটকে অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে দুর্ভিক্ষের বাস্তবরূপ চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সাঈদ আহমদ বাংলা মায়ের যে অবয়ব উপস্থাপন করেছেন, তা ইতঃপূর্বে অনুদ্ঘাটিত ছিল। নাট্য-সমালোচক আতাউর রহমান যথার্থই বলেছেন–

> তাঁর বাংলা মা উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের, নিটোল পয়োধরা, উর্বরা কোন নারী নয়– এ বাংলা মা শীর্ণ, বিশুষ্ক, লোলচর্ম স্খলিতস্তনা, বিধ্বস্ত এক নারী। সমগ্র মুখাবয়বে তাঁর বন্যা, দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর বলিরেখা। অক্ষমতার হতাশা তার দু'চোখ জুড়ে, যে মা তাঁর সন্তানকে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোগাতে পারে না। রূপকথার বাংলা মায়ের মুখোশ ছিন্ন করে সাঈদ আহম্‌দ আমাদের উপহার দিলেন এ সত্যিকার বাংলা মাকে। (হাসনাত, ২০১২ : ৬৩২)

এই দুর্ভিক্ষ সকলের মরণদূত হলেও, গোরখোদকের জন্য এসেছে সৌভাগ্যলক্ষ্মী হয়ে। আশেপাশের গ্রামে যেহেতু কোনো গোরখোদক নেই, সুতরাং এর বদৌলতে একমাত্র তার ঘরে উঠবে প্রচুর ফসল। গোরখোদককে চৌকিদার 'ফালতু' বলে

ভর্ৎসনা করলেও চরিত্রটি স্পষ্টবাদী। জন্ম কিংবা মৃত্যু নয়, মানুষের 'আসা এবং যাওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে তার অধিক উৎসাহ। অতঃপর সাইকেল-যোগে রাজপথে এক ডাকপিয়নের আগমন ঘটে। এদের কথোপকথনসূত্রে প্রতীয়মান হয়, তারা কেউ মৌলিক নয়, প্রত্যেকেই কর্মক্ষেত্রে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত। পূর্বের চৌকিদার, গোরখোদক কিংবা ডাকপিয়ন প্রাণ হারিয়েছে মন্বন্তরে। চিঠি বিতরণের উদ্দেশে সকাল থেকে রাজপথে বিচরণ করলেও প্রাপকদের একজনকেও জীবিত পায় না ডাকপিয়ন। দুর্ভিক্ষের হিংস্র থাবায় প্রতিটি গ্রাম হয়ে গেছে শ্মশান। এতৎ-পরিস্থিতিতে তারা সকলেই অতিবাহিত করতে চায় কিছু উদ্দেশ্যহীন সময়, যেখানে চৌকিদার মাইলপোস্টের নামফলকগুলো পরিবর্তন করতে থাকে, গোরখাদক খেলা করে হাড়গুলো নিয়ে এবং ডাকপিয়ন পাঠ করে মৃতদের চিঠি। চৌকিদার, গোরখোদক এবং ডাকপিয়ন একে অপরের অচেনা। এতৎসত্ত্বেও তারা যেভাবে পারস্পরিক যুক্তি-তর্ক, মান-অভিমানে লিপ্ত থেকেছে, মনে হয় তাদের বন্ধুত্ব অনন্তকালের। এরা সমাজকাঠামোর এমন তিনটি পর্যায়ের প্রতিনিধি যেখান থেকে দুর্ভিক্ষকে উপলব্ধি করা যায় প্রত্যক্ষভাবে। প্রথম দৃশ্যের শেষমুহূর্তে দুই সন্তানসহ রাজপথে আসেন এক মা। একসময় তাদের গ্রামও ছিল শস্যশ্যামল; কিন্তু মন্বন্তরের কারণে তা পরিণত হয়েছে ধূ-ধূ মরুভূমিতে। তাই নিরাপদ গ্রামের সন্ধানে তারা যাত্রা করে। রাজপথে আলাপরত তিন ব্যক্তিকে এরা মনে করে রিলিফ কমিটির সদস্য। এ ধারণা ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হলে আশাভঙ্গের যাতনায় তাদের কর্মকাণ্ড হয়ে পড়ে উদ্ভট।

প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার চরিত্রগুলোর বাস্তবধর্মী রূপায়ণ করেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রারম্ভে জনৈক সঙ দর্শকদের বলে–'আসুন, আমরা অলৌকিকের জন্য অপেক্ষা করি।' এ দৃশ্যে মা তার সন্তানসহ চৌকিদারদের ভোজন করায়। লক্ষণীয় যে, 'মা এক লোকমাও মুখে দেননি। সব ছেলেদের খাইয়ে দিয়েছেন।' তার অকৃত্রিম এবং আন্তরিক আপ্যায়নে সকলে পরিতৃপ্ত হলেও চৌকিদারর মনে হয়েছে – 'বেঁচে থাকতে হলে আরও অনেক সাবধানী হতে হবে। কারণ খাদ্য সীমিত।' এই সীমিত আহারে মা সঙকে নিমন্ত্রণ করলে বড় সন্তান তাকে করতে চায় বাস্তবসচেতন। এ পর্যায়ে মা সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত না থেকে উন্নীত হন শাশ্বত মাতৃসত্তায় – 'লক্ষ লক্ষ লোক উপোস করছে। কিন্তু এই একজন এখান থেকে না খেয়ে যেতে পারে না। সে ঐ মুহূর্তে ঠিক তোমাদের মতোই আদরের। কখনও মায়ের চোখের সামনে ছেলে উপোস করতে পারে না।' দৃঢ়চেতা এ নারী ঘোর সংকটেও তাদের আশাবাদী হবার পরামর্শ দেন এবং হাশরের দিন স্রষ্টার নিকট এ দুর্যোগের ইতিহাস বর্ণনা করতে চান। এসময় মায়ের আচরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ব্যাপক পরিবর্তন। দুর্বিষহ বিপদ থেকে বাংলার লক্ষ লক্ষ সন্তানকে পরিত্রাণের পন্থা মা অবগত হন অলৌকিকভাবে। স্বপ্নের মধ্যে এক দিব্যপুরুষ তাকে আদেশ দেন :

> তুমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তোমার ছেলেকে উৎসর্গ করবে। বাংলা মাকে তার নামের গৌরব দান করবে। একটা বড় ছোরা দিয়ে তোমার ছেলেকে কোরবানি করো। ফিনকি দিয়ে উছলে পড়া রক্ত লাখো লাখো মানুষের পাপকে ধুয়ে দেবে। একজনের ত্যাগে ঋণ শোধ হবে হাজারো মানুষের – মুক্ত হবে ওরা। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

মানবতার মুক্তির জন্য, ক্ষুধার্ত শিশুর অন্নের জন্য, সর্বোপরি বাংলাকে পুনরায় সুখী, সমৃদ্ধ ও আনন্দমুখর করতে মা তার সন্তানকে উৎসর্গ করতে চান এবং এজন্য সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। *মাইলপোস্ট* নাটকে কঠিন জীবনযন্ত্রণার সমান্তরালে 'হতাশার বন্ধনকে ছিন্ন করে জীবনের আশাবাদের অভিমুখে মানবিক প্রয়াসেরও উজ্জ্বল আভাস মেলে। কিন্তু এই পথ অনিবার্য বিভ্রান্তি ও দায়হীন বিচ্যুতির অভিযান। তাই মাইলপোস্টকে ঘিরে জড়ো হওয়া ভ্রাম্যমান মানুষেরা অলৌকিক স্বর্গীয় সমাধানে দুর্ভিক্ষের দাবানলকে নির্বাপিত করতে চায়। এখানে গোরখাদক কিংবা চৌকিদার, কিংবা ডাকপিয়ন, মা ও তার সন্তানেরা বাস্তবঘেঁষা চরিত্র থাকে না, বরং হয়ে ওঠে বহুমুখী জীবনদর্শনের দ্বন্দ্বময়তার চিন্তাস্রোত।' (মেহের, ১৪০৫ : ১৮-১৯)

তৃতীয় দৃশ্য সংঘটিত হয় পরের দিন ভোরবেলা। আসন্ন বিপদে আতঙ্কগ্রস্ত দুই ভাই পলায়ন করে। কিন্তু কোনোখানেই তারা বেঁচে থাকবার নিশ্চয়তা পায় না। কেননা মৃত্যুর হাহাকার সর্বত্রব্যাপী। মহামারীর গ্রাস থেকে কারো রক্ষা নেই। ক্ষণিক মুক্তি পেলেও অন্যদিন ঠিকই তাদের ধাওয়া করবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। একারণে আত্মবিসর্জনই দুজনের নিকট উত্তম বলে বিবেচিত হয়। তাদের রাজপথের সঙ্গীরাও জানে এ আত্মত্যাগ প্রথম নয়, এরূপ বলিদান পবিত্র এবং ঐতিহাসিকভাবেও পরীক্ষিত। চৌকিদার বলেছে– 'লক্ষ বছর আগেও মনোনীত ব্যক্তিকে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু, একমাত্র সন্তানকে উৎসর্গ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে সবকিছু অনেক বদলে গেছে।' এদিকে মা জানেন না, কোন্ সন্তানকে নিবেদন করতে হবে। শেষপর্যন্ত অলৌকিক হস্তক্ষেপেও ভাগ্যপরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না। কারণ 'আধুনিক মানুষের সমস্যা তো আর সত্যযুগের প্রেরিত-পুরুষদের সরল, শ্বেত, শুভ্র সমস্যা নয়।' (হাসনাত, ২০১২ : ৬৩৩) নিজের সঙ্গে, পরিবেশ-প্রতিবেশের সঙ্গে তারা প্রতিনিয়ত সংগ্রামলিপ্ত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। তাই আশার সন্ধান হারিয়ে কঠিন নৈরাশ্য-ব্যথায় ভোগে সহায়সম্বলহীন মানুষজন। এতদ্বিষয়ে কবি ও সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমানের অভিমত নিম্নরূপ :

> ইব্রাহিমের সন্তান উৎসর্গের প্রতিভাসে গড়া 'মাইলপোস্টে'র স্বপ্ন সংকেতটি যেন একথাই মূর্ত করে যে, ত্যাগ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা উন্মাদনার সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সত্যি ত্যাগ বাস্তবে ঘটে না। সেজন্য ফলাফল পূর্বাপর এক। ত্যাগের প্রেরণায় যে মহতী উদ্বোধন আমাদের মনে ঘটে তা কার্যকারিতার অভাবে একেক সংক্ষোভের

> পর স্তরে স্তরে মিইয়ে যায়, নিষ্ফল হয়ে পড়ে। তাই মানুষের সর্বজ্ঞ তৃতীয় নয়নের উদ্ভব হচ্ছে, যুগে যুগে তার সৃষ্টিক্ষমতা উজ্জ্বলতর হচ্ছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিকার হচ্ছে না। এই সত্য মানুষ জেনে ফেলেছে, তাই দুঃখ আরো দুর্বহ। (হাসনাত, ২০১২ : ৬৪৩)

আবার কোনো কোনো সমালোচক মায়ের সন্তান বিসর্জনের বিষয়টিকে অবলোকন করেছেন তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে –

> সাঈদ পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভেতরে দুর্ভিক্ষকে প্রতীকায়িত করেছেন বাংলার মানুষের মুক্তির সমস্যা হিসেবে। অন্যদিকে, বিমূর্তভাবে যে কোনো স্থানের মানুষের সত্তাগত মুক্তির প্রশ্নটিও দুর্ভিক্ষের আকারে জারি থাকে এই নাটকে। নাটকটির বিষয়বোধে পাকিস্তানের ইসলামী ভাবাদর্শকেও সমস্যাজনক প্রতীয়মান হয়। পাশাপাশি, অজ্ঞাতনামা বাংলা মায়ের খোয়াবনামা স্পষ্টতই ইঙ্গিত করে পূর্ববাংলার বাঙালি মুসলমানের মনে জাগরুক মুক্তি-গন্তব্যকে। আবার দরবেশ চিত্রকল্পের মাধ্যমে কাঠামোগত অবয়বটিকে গ্রহণ করে বাংলা মায়ের [মুসলমান] সন্তানদের নমনীয় ও উদার ইসলামি বিশ্বাসকেও আত্তীকৃত করেছেন। কোরবানির পুরাণকে প্রয়োগ করেছেন বাংলা মায়ের দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির জন্য পুত্র উৎসর্গের রাজনৈতিক সংগ্রামের সমীকরণে। (শাহমান, ১৪২২ : ১০৬)

এই মন্বন্তর মনুষ্যসৃষ্ট। ডাকপিয়ন তার অভিজ্ঞতাসূত্রে বর্ণনা করেছে – 'মানুষই মানুষকে ধ্বংস করেছে। এ প্রক্রিয়া মন্থর। কিন্তু শীগগিরই কতগুলো জোরদার প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতে চলেছে।' এ পর্যায়ে তাদের মনে হয় একটু নিরাপত্তার আশ্বাস পেলেই 'ড্রাগন তার উষ্ণ নিঃশ্বাস আছড়ে দেয়, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদাহ পৃথিবীর গায়ে ফোস্কা ফেলে দেয়।' এমন নিদারুণ জীবনসংকটে তারা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। চৌকিদার রাজপথের শান্তিরক্ষক হলেও জীবনের নিষ্ঠুর নিশ্চয়তার প্রতীক মাইলপোস্টকে ভেঙে খণ্ডবিখণ্ড করে, 'যেন সে কখনও মানুষের সামনে মাথা তুলতে না পারে, কখনও আবার যেন ধৃষ্ট, জেদি, স্থবির, হয়ে না ওঠে।' অন্য সঙ্গীরাও তার অনুগামী হয়। সঠিক নির্দেশনালাভে ব্যর্থ হয়ে মাইলপোস্টটি ভেঙে তারা প্রচলিত প্রথা ও নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং নতুন গন্তব্য অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়। তবে তীব্র ক্রোধ, জরা-ক্ষুধার মধ্যেও কেবল অবিচল থাকেন মা। আবহমান বাঙালি সংসারে মায়ের যে রূপ পরিদৃষ্ট হয়, *মাইলপোস্টে*র মা তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাঈদ আহমদ চরিত্রটিকে একটি ভিন্ন রূপকল্প প্রদান করেছেন। মূলত 'বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অত্যাচারিত নিরন্ন বেদনাক্লিষ্ট হতাশাগ্রস্ত মাকে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন আধুনিক জীবনচেতনায়।' (সুকুমার, ১৯৯৮ : ৩২৯) কঠিন জীবনসংগ্রামে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তিনি থাকেন আশাবাদী এবং এ সঞ্জীবনী মন্ত্র তিনি সঞ্চারিত করতে চান সন্তানদের চেতনালোকে। তার স্পষ্টোচ্চারণ– 'আমার সোনার মানিকরা, সাহস ধর। বাংলা মার মুখে হাসি

ফোটাতেই হবে। নতুন ভোরের আলোর রশ্মি চারদিকে ছিটকে পড়ছে। এখন থেকে সোনালী ইতিহাস শুরু হবে।' এভাবে এক বৈরাগ্যধর্মী ঘটনাপ্রবাহে নাটকটি অগ্রসর হলেও শেষাবধি সোনালি ভোরের স্বপ্ন দেখিয়েছেন নাট্যকার।

চার

অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে রচিত *তৃষ্ণায়*[৪] সাঈদ আহমদের একটি রূপক নাটক। সামরিক আমলাতন্ত্রের বিভীষিকাময় পরিবেশে রূপকের ছদ্মাবরণে রচিত হয় নাটকটি। *তৃষ্ণায়* নাটকে শেয়াল এবং কুমিরের লোককাহিনির অন্তরালে 'অভিব্যঞ্জিত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ এবং একই সঙ্গে সেই শোষণ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। রূপকথার মাধ্যমে আধুনিক জীবনযন্ত্রণা ও শ্রেণীসংগ্রাম উপস্থাপন করে সাঈদ আহমদ বাংলাদেশের নাটকের ধারায় সংযোজন করেছেন একটি নতুন মাত্রা।' (বিশ্বজিৎ, ২০০৯ : ১৪৬) এতৎপ্রসঙ্গে নাট্যকারের স্বীকারোক্তি – '*তৃষ্ণায়* নাটকটি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লেখা। এখানে প্রতীক অর্থে নেওয়া হয়েছে শেয়াল এবং কুমিরের গল্প ও চরিত্র। শেয়াল কুমিরের সব বাচ্চা একে একে খেয়ে ফেলে, সেই পুরনো লোককাহিনির ওপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত হলেও মূলত পাকিস্তান সামরিক শাসনের পটভূমিতে নাটকটি রচিত ছিল।' (হাসনাত, ২০১২ : ২২৬) এ নাটক মঞ্চায়নের পর তৎকালীন সামরিক সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েন সাঈদ আহমদ। নাট্যবিষয়ক ভাষণে তিনি বলেন – 'ইয়াহিয়া খানকে উপলক্ষ করে লিখলাম *তৃষ্ণায়*। আমার চাকরি যাবার যোগাড়। আল হামরাতে, বড় স্টেজে মঞ্চস্থ করলাম লাহোরে। পিণ্ডিতে বদলি করে দিল। আমার মতে এটাই পলিটিক্যাল প্লে বলতে পারি।' (হাসনাত, ২০১২ : ৫৭৩) এ ধরনের নাটক রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকাংশে তিনি বলেছেন–

> আমার ধারণা কোন রূপকথা বা লোককাহিনী সমকালীন সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করে না যদি সে গল্প সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক বা অর্থবহ হয়ে ওঠে। সে সময়ে দেশ, সমাজ এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চিরন্তন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি সমস্যার প্রেক্ষিতে শিয়াল ও কুমীর ছানার গল্প আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত বলে মনে হয়েছে। এ সমস্যা হলো মানুষের অস্তিত্বের এবং টিকে থাকার সমস্যা। বড় মাছ ছোট মাছকে উদরসাৎ করে, বৃহৎশক্তি ক্ষুদ্রশক্তিকে ধ্বংস করে, এটাই স্বাভাবিক এবং চিরন্তন সত্য। ডারউইনও তাই survival of the fittest-এর থিয়োরী দিয়েছেন। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো সত্যি কি তাই ? শিয়াল পণ্ডিত ও কুমীরের সাতটি ছানাকে আমাদের জীবননাট্যের অঙ্গনে আমি যেন এক নতুন ভূমিকায় দেখতে পেলাম।...শিয়াল আর কত খাবে, একদিন নিশ্চয় তার বিতৃষ্ণা আসবে, খেতে খেতে অসুস্থ হয়ে পড়বে। (হাসনাত, ২০১২ : ৬৩৩)

সিকান্দার আবু জাফর এর পূর্বে বিভিন্ন জাতের পাখির রূপকে *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১) নাটক রচনা করলেও লোককাহিনি অবলম্বনে আধুনিক জীবন চেতনাসমৃদ্ধ

কোনো নাটক বাংলাদেশের নাট্যাঙ্গনে ইতঃপূর্বে সংযোজিত হয়নি। এদিক থেকে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট *তৃষ্ণায়* নিঃসন্দেহে সাঈদ আহমদের একটি দৃষ্টান্তযোগ্য শিল্পকর্ম। নাটকের প্রথম অঙ্কে অরণ্যের মধ্যে পশুদের একটি বৈকালিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার সমন্বয়ক থাকে গাধা। বহু তিরস্কার-গঞ্জনা সহ্য করলেও এমন মহান দায়িত্ব অর্জনের কৃতিত্বে সে গর্বিত। মানব-মানবীর হাসি-কান্না, বুদ্ধি, দীপ্তি, সংবেদনা ও আত্মমর্যাদার প্রকাশস্থল হিসেবে নাট্যমঞ্চ ব্যবহৃত হয়েছে দীর্ঘকাল। বনের পশুরাও প্রতীক্ষায় ছিল তাদের বেদনা-বিলাপ জনসম্মুখে প্রকাশ করবার জন্য। সমন্বয়ক গাধা শুরুতেই নিবেদন করে– 'অসীম ধৈর্য, গভীর আগ্রহ, নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে কেবলি অপেক্ষা করেছি। আজকে আমাদের পালা। একটু সময় দিন। আমাদের বক্তব্য সবার সামনে পেশ করতে চাই। আপনারা বিবেচনা করবেন। এবং বিচারও করবেন।' (প্রথম অঙ্ক)

অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে এক বয়োবৃদ্ধ বাঘও রয়েছে। তবে পশুদের নিকট সে খুব একটা ভয়ের উপলক্ষ্য নয়, বরং বিবিধ সংকটে নিজেই ভারাক্রান্ত। তৎসত্ত্বে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে– 'যতক্ষণ সভাস্থলে আছি এবং সভার শেষে নিজের নিজের গুহায় না পৌঁছোচ্ছি ততক্ষণ কেউ কাউকে বিপর্যস্ত করব না। মানে খাব না।' হঠাৎ সভাস্থলে আসে একটি কুকুর। তার ওপর মানবসম্প্রদায়ের নির্মমতার বৃত্তান্ত সে পশুদের মাঝে প্রকাশ করে অকপটে। দুমুঠো খাবারের জন্য তাকে মানবঘর পাহারা দিতে হয় রাতের পর রাত। দারোয়ান ঘুমিয়ে গেলেও অবিশ্রাম পাগলের মতো সে ঘুরে বেড়ায় চার দেয়ালের আনাচে-কানাচে। একটু আরামের জন্য শোবার ঘরে গেলেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাকে নিগৃহীত করে মানবসমাজ। এরপরেই সভাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করে মা কুমীর এবং শেয়াল। শেয়াল তার কুরূপতার জন্য দীর্ঘযুগ ধরে এক প্রকার মানসিক জটিলতায় ভুগছে এবং এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সে বুদ্ধিকে শাণিত করেছে। বাক্যবাগীশ শেয়ালকে অনুষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত করে সভাস্থ পশুকুল। আলোচনাসভা থেকে স্পষ্ট হয় তাদের একত্র হওয়ার কারণ মনুষ্যজাতির প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ। কেননা মানবগোষ্ঠীর সম্প্রসারণের ফলে জঙ্গল ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। মনুষ্যকুল তাদের গৃহস্থল থেকে স্থানান্তরিত হলে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু বনের পশুদের ক্ষেত্রে নেই কোনো আশানুরূপ সমাধান। এ কারণে নিজ সন্তানদের আগামী দিনের নিরাপত্তা-নিশ্চয়তার লক্ষ্যে তারা একজোট হয়। আসন্ন বিপদ থেকে উত্তরণে তারা প্রথমে আল্লার শরণাপন্ন হয় এবং নিপীড়িত-নির্যাতিত এ শ্রেণি দিশেহারা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করে স্রষ্টার নিদ্রাভঙ্গ করতে চায়। এসময় কুমীর আত্মসমর্পণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে সভাপতি এ কাজকে আখ্যায়িত করে 'কুলের কলঙ্ক' হিসেবে; তার বিবেচনায় সংগ্রাম অনিবার্য। পশুকুলের উদ্দেশে সভাপতি হিসেবে শেয়াল যে উদ্দীপনাময় বক্তব্য প্রদান করে, তা উদ্ধৃতিযোগ্য :

> ব্যাপক ধ্বংস ঘটাব ! মনে রাখবে, আমরা পরিত্যক্ত নই। যে খোদার আশ্রয় ওরা নেবে সেই খোদা গরীবের দিকেও নজর দেবেন। আমরা নিরুপায়, নিঃসহায়, আমাদের কান্না ওর কানে পৌঁছাবে। নদী-নালা, গুহা-পর্বত সব কিছুকে সুরক্ষিত করো। প্রচার করে দাও অলিতে-গলিতে, দেশ-দেশান্তরে যে অত্যাচারীর দল আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, অস্তিত্ব আর স্বপ্নকে দুমড়ে মুচড়ে নির্জীব করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নরাধমের সুপুত্রেরা কাপালিকের আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। এসো, ওঠো, জাগো, এবারে জাগার পালা। (প্রথম অঙ্ক)

এ ধরনের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মুগ্ধ হয়ে কুমীর তার সাত সন্তানকে শিক্ষিত করতে শেয়ালের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। শেয়াল প্রথমে এ আবেদন অগ্রাহ্য করলেও কুমীরের কাতর অনুরোধে তার সন্তানদের সমাজের যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়। দ্বিতীয় অঙ্কে জানা যায়, কুমীরের স্বামী জগৎজীবন সম্পর্কে নিতান্ত উদাসীন। সন্তানদের জ্ঞানচর্চায় ঘোর আপত্তি তার। অন্যদিকে তার স্ত্রী নারী হয়েও জীবন সংঘাতে বিজয়ী হতে বদ্ধপরিকর। এজন্য সন্তানদের বিদ্বান, ভদ্র, সরল, মার্জিত এবং খোদাপরস্ত করে তুলতে সে স্বামীর অগোচরে সাত সন্তানসহ উপস্থিত হয় শেয়ালের আশ্রমে। ভক্তদের দেখে শৃগালও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়। আশ্রম ত্যাগের পূর্বে মা সন্তানদের উপদেশ দেয় – 'আমার সোনা-মানিকরা। মনে রাখবে আজ থেকে ওই তোমাদের ত্রাণকর্তা। কোন আওয়াজ তুলবে না। কোন বিদ্রোহ বা আপিল চলবে না। গুরুজন পর্দার অন্তরালে কী হচ্ছে তাও দেখতে পারে। সম্মান করো, তোমরাও কোনদিন হয়তো সম্মানিত হবে।' শেয়াল প্রথমে শিষ্যদের গণিতশাস্ত্রে প্রশিক্ষিত করে এবং এরপর সে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় জটিল বিষয়াদির অবতারণা করে। কিন্তু তার শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় অল্পমুহূর্তেই কুমীর-শাবকদের মধ্যে জেগে ওঠে বিরক্তিভাব। ডুক্‌রো অকুণ্ঠচিত্তে তাকে জানিয়ে দেয় – 'তোমাদের কথাবার্তা মোটেই ভালো লাগে না।' যে ঈশ্বর অদৃশ্য, যাঁর কোনো অস্তিত্ব সে অনুভব করতে পারে না, এমন ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক বক্তৃতায় সে আগ্রহ লাভ করে না। ডুক্‌রো মায়ের কাছে প্রত্যাবর্তনের বাসনা প্রকাশ করে এবং প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গে খেলতে চায় নদীর ধারে। তারপরই উন্মোচিত হয় শৃগালের ধূর্তরূপ। রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় লিপ্ত হয় সে। মায়ের কাছে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে নদীর ধারে ডুক্‌রোকে গ্রাস করে। এরপর আশ্রমে এসে ডুক্‌রো-প্রসঙ্গে সরলপ্রাণ কুমীরশাবকদের সে বলে – 'আমি ওকে বেহেশতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে এখন বুঝতে পারবে খোদা কোথায় এবং কেন আছেন।' এভাবে শেয়াল শিষ্যদের নিকট পরিগণিত হয় জন্তুদের দেবতারূপে।

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতে প্রতীয়মান হয় ফুকরো ব্যতীত শৃগাল গলাধঃকরণ করেছে সকল কুমীরছানা। একারণে সে আতঙ্কগ্রস্ত এবং খানিকটা পাপবোধে আচ্ছন্ন। অন্যদিকে ভাইদের মধ্যে কেবল ফুকরো পরিণত হয়েছে পণ্ডিতের 'উপযুক্ত সাগরেদে'। সহোদরদের হত্যাকারীর প্রতি তার হৃদয়ে কোনো ঘৃণাবোধ জাগ্রত হয়

না, উপরন্তু শেয়ালের সাহচর্যে সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। গুরুর গতি, চিন্তা এবং ভাবের স্পন্দনে সে রীতিমতো আলোড়িত হয়। শেয়ালের নিকট ভাইদের প্রাণ হারানোর প্রক্রিয়া ফুকরোর কাছে স্বাভাবিক প্রতিভাত হয়। প্রাসঙ্গিক সংলাপ উল্লেখযোগ্য –

শেয়াল : তোমার কি মনে হয়, ওদের সঙ্গে ন্যায় আচরণ করিনি?

ফুকরো : হ্যাঁ একের পর এক ওদের চিবিয়ে মজিয়ে খেয়েছ। হাড়গোড় ফেলে দিলে নদীর ধারে। হয়তো আরও ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের জানোয়ারদের জন্যে। প্রত্যেকবার লক্ষ্য করেছি। তোমার চোখেমুখে নির্বিঘ্ন প্রশান্তির ছায়া, তোমার ঘন নিঃশ্বাস অনন্ত ক্ষুধার সাক্ষ্য। প্রথমে লেজ, তারপর শরীর। সব শেষে ছোট্টো মাথা। আমার কিন্তু গোটা জিনিসটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। আশা করি তুমি সৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত ছিলে। (তৃতীয় অঙ্ক)

ফুকরোর মতে অতীত কাপুরুষদের জন্যে এবং বর্তমানের বাইরে 'সব ভোজবাজি আর মরীচিকা।' এমন শিষ্য অর্জনে পণ্ডিতও গর্বিত। এসময় মানুষের সীমাহীন দৌরাত্ম্য সম্পর্কে শেয়ালকে অবগত করতে আশ্রমে আসে গাধা। মনুষ্যজাতির অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে জঙ্গলকে নিরাপদ রাখবার প্রত্যয়ে শেয়াল সভাপতি নির্বাচিত হলেও পশুদের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সে মৌন থাকে। প্রথম দৃশ্যে বনপালের উদ্দীপ্ত বক্তব্যের কোনো বাস্তবধর্মী প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হয় না তার এ পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে; বরং কুমীর জননীর রোষানলের ভয়ে তাকে বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে দেখা যায়। এদিকে ফুকরো শেয়ালের অসুস্থতার প্রসঙ্গ উত্থাপনের মাধ্যমে গাধাকে নিবৃত্ত করতে চায়। ডারউইনের survival of the fittest তত্ত্বের অনুরণনে এসময় ফুকরোর নিকট গাধা জঙ্গলে দেখা তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এভাবে–

> এইত কেবল সেদিন, এক মাকড়সা এক পিঁপড়ে খেলো। সেই মাকড়সাকে বিড়াল খেলো, বিড়ালটাকে কুকুর খেলো, আর কুকুর গেলো হায়নার মুখে, সর্বশেষ হায়না সাবাড় হলো বিরাট এক বাঘের পেটে। তারপর বাপরে কী অস্বস্তি। অগত্যা বাঘ সাহেব কাকুতি-মিনতি করলেন ঔষধ বাতলে দিতে। নিষ্পাপ বোধিবৃক্ষের একটি জ্যান্ত পাতা। বৎস, সব ঠিক হয়ে গেল। (তৃতীয় অঙ্ক)

এরপর কুমীর মাকে আশ্রমে দেখে শেয়াল যখন প্রচণ্ডভাবে উৎকণ্ঠিত, তখন তাকে উদ্ধারের ব্রত নেয় স্বয়ং ফুকরো। শৃগালের হয়ে সে অসংকোচে মায়ের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মা বসন্ত-উৎসবে শিক্ষিত সন্তানদের সগোত্রীয়দের মাঝে পরিচিত করতে চায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার অলৌকিক মহিমায় ভাস্বর ফুকরো তাকে সাফ জানায় – 'আমাদের পৃথিবী অন্য। তোমাদের ওখানে একেবারে বেমানান মনে হবে।' একের পর এক দার্শনিক তত্ত্ব পরিবেশন করে সে মায়ের নিকট নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশে ব্যস্ত থাকে। বিদ্যার্জনের অহংকারে আত্মহারা ফুকরো তার স্বজাতির সঙ্গে নতুন কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। সন্তানের এ ধরনের নিষ্ঠুর বক্তব্যে মা হয়ে

পড়ে দিশেহারা। তার বুঝতে বাকি থাকে না যে, সন্তানদের মানসিকতার রূপান্তর ঘটিয়েছে শেয়াল। তাই সে অন্য সন্তানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়। কিন্তু ফুকরো এতেও নানারকম অজুহাত তৈরি করে। কখনও নিজেকে দলপতি এবং দলপতি ভিন্ন অন্যদের সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎ বারণ, কখনও ভাইদের মাকে চিনতে না পারার মতো অসত্য তথ্য সে অবলীলায় বলতে থাকে। এরসঙ্গে যুক্ত হয় শৃগালের বাক্‌চাতুর্য। প্রতিফলে সন্তানদের বুকে না পাওয়ার মনঃকষ্টে মা আপাতত প্রস্থান করে। কুমীর জননীকে চূড়ান্তভাবে ঠকানোর জন্য ফুকরোর সহযোগিতায় শেয়াল গ্রহণ করে নয়া-কৌশল :

শেয়াল : আমি গাছের পেছনে চলে যাব। প্রথমত আমি তোমাকে দেখাব দূর থেকে, একটি সন্তান। তারপর আবার গাছের আড়ালে যাব। আবার এর পুনরাবৃত্তি।...সাতবারের মাথায় আমাকে থামিয়ে দিও। নইলে চক্রের আবর্তনে অনন্তকাল অবধি সন্তানের খেল দেখাতে থাকবো।

ফুকরো: আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমার পদতলে বসতে পেরেছি বলে আমি গর্বিত। তার উপর মা চোখে ভালো দেখতে পায় না। নানা মন্ত্রবলে আমার শরীরকে বিভিন্ন মাপে আর গঠনে পরিবর্তন করতে পারি। (তৃতীয় অঙ্ক)

শেয়াল নিশ্চিত হয় ফুকরো তার জয়নিশান ওড়াবে দিগ্বিদিক। অন্যদিকে তাদের মহড়াকালে সকলের অলক্ষ্যে আশ্রমে প্রবেশ করে মা কুমীর। শৃগাল আর ফুকরোর চক্রান্ত সে উপলব্ধি করতে পারে অনায়াসে। তবে সে সংক্ষোভে ফেটে পড়ে না। পরম ধৈর্য্যে কুমীর জননী আত্মস্থ করতে থাকে অস্তিত্ববাদের মূলমন্ত্র :

> শেয়াল পণ্ডিত, আমি অন্তর দিয়ে জানি তুমি এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তোমার সহিষ্ণুতা আর সততার গুণ চিরদিন গাইব। আমার মানিকদের নিয়ে যেতে আমি চাই না। কোন দিন তেমন বোকামি করব না। আমি জানি ওরা নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করছে।...কিন্তু আবার আসব।...তোমার দয়া, ভালোবাসা আর দরদি মনের কিস্‌সাকাহিনি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে। (তৃতীয় অঙ্ক)

অশুভশক্তির সঙ্গে লড়াই করে নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখতে এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রগতির পথে যাত্রাকালে যে নিরন্তর সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী– তাই প্রতীকীভাবে শব্দরূপ পেয়েছে উপর্যুক্ত সংলাপে। এ নাটকে শেয়াল তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠীর প্রতিচ্ছবি, যারা ছলে-বলে-কৌশলে পূর্ববাংলার নিরীহ-সরল জনসাধারণের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন এবং সম্পদ হরণে লিপ্ত। ফুকরোর মতো এদেশীয় কিছু স্বার্থান্ধ শ্রেণির যোগসাজসে তাদের অপকর্মের প্রক্রিয়া হয়েছিল সহজতর। তবে এদের প্রতারণায় নিঃস্ব কুমীর জননীরূপী বাঙালি সর্বস্ব হারিয়েও পরাজয় বরণ করে না; 'সাত নয়, সত্তর নয়, কোটি কোটি নিষ্পাপ শিশু' সঙ্গে নিয়ে সে শেয়ালের আশ্রমে হানা দিতে চায়। সন্তান শোকে পাথর কুমীর

জননী এসময় শেয়ালের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয় কঠিন চ্যালেঞ্জ – 'আমি সারা গোষ্ঠীকে নিয়ে আসছি। এ বংশের শেষ নেই। এক অনন্ত সূত্র।'

বিভাগোত্তর পর্বে সাঈদ আহমদ বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য শিল্প-উপকরণের সঙ্গে দেশজ ঐতিহ্যের যোগসূত্র-স্থাপন করেছেন। একারণে আঙ্গিক এবং উপস্থাপনায় তাঁর নাটক পাশ্চাত্যধর্মী হলেও এর বিষয়বস্তু হয়েছে সমকালীন বাংলাদেশ। এ ভূখণ্ডের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণা কিংবা স্বৈরাচারী অপশক্তির ঘৃণিত তৎপরতা তাঁর নাটকে শব্দরূপ পেয়েছে। তবে এ পর্যায়ের নাটকে পূর্ববাংলার জনজীবনের অন্তর্বেদনা প্রতিফলিত হলেও তা নাট্যকারের লেখনীতে নৈরাশ্যব্যঞ্জক হয়নি; বরং সাঈদ আহমদ অ্যাবসার্ড রূপকল্পে চরম সঙ্কটাপন্ন পরিবেশে সংগ্রামকে সত্য মনে করেছেন, মৃত্যুর সম্মুখে অবলীলায় ঘোষণা করেছেন প্রাণের নিঃসংশয় বার্তা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

[১] ইউনেস্কোর সঙ্গে সাঈদ আহমদের সম্পর্কের বিবরণ পাওয়া তাঁর একটি ভাষণে – '১৯৭৬ সনে ইউনেস্কোর সঙ্গে জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন আমি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে Asian আর্টের ওপর ক্লাশ নিতাম। সেই সময় বক্তৃতা দেবার জন্য ইউনেস্কো এসেছিলেন। তখন থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। প্যারিসে গেলে ইউনেস্কোর বাড়ি যেতাম।' (হাসনাত, ২০১২ : ২০৩)

[২] *কালবেলা* সর্বপ্রথম ইংরেজিতে *The Thing* (১৯৬১) নামে 'দি ভিশন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে বজলুল করিমের অনুবাদে নাটকটি ঢাকার তোপখানা রোডের ইউসিস মিলনায়তনে মঞ্চস্থের মাধ্যমে সর্বমহলে সমাদৃত হয় এবং পরের বছর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত মাসিক 'পরিক্রম'-এর ২য় বর্ষ : একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা এবং ৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক : কালবেলা, মাইলপোস্ট, তৃষ্ণায়* গ্রন্থে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। সাঈদ আহমদ তাঁর *কালবেলা* উৎসর্গ করেন কবি শামসুর রাহমান, নাট্যশিল্পী বজলুল করিম এবং তাঁর ভাই নাজির আহমদকে।

[৩] *মাইলপোস্ট* নাটকের রচনাকাল ১৯৬২-১৯৬৪। ইংরেজিতে রচিত এ নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন নাট্যজন আতাউর রহমান। *মাইলপোস্ট* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকার ৬৭শ বর্ষ : ২য়-৪র্থ সংখ্যায়। ১৯৬৫ সালে সাতরং নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় নাটকটি বাংলা একাডেমি আয়োজিত নাট্য মৌসুমে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এতে অভিনয় করেন আবদুল্লাহ আল-মামুন, আতাউর রহমান, সাবেরা মুস্তাফা প্রমুখ। নাটকটির শব্দ, ধ্বনি ও সঙ্গীত সংযোজনা করেন রামেন্দু মজুমদার এবং নির্দেশনা প্রদান করেন আসকার ইবনে শাইখ।

[৪] *তৃষ্ণায়* নাটকের রচনাকাল ১৯৬৪-১৯৬৬। পাশাপাশি *The survival* নামে নাটকটি ঐ সময় ইংরেজি সাপ্তাহিক *Holiday*-তে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সাঈদ আহমদের *তৃষ্ণায়* নাটক একাধিক ভাষায় অনূদিত এবং বিদেশে মঞ্চস্থ হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

উর্ধ্বেন্দু দাশ (জানুয়ারি ১৯৯৬)। 'প্রসঙ্গ : অ্যাব্সার্ড ড্রামা, জীবনে ও মঞ্চে'। *অ্যাব্সার্ড* কুন্তল চট্টোপাধ্যায় (ডিসেম্বর ২০০১)। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। রত্নাবলী, কোলকাতা

নাটক [সম্পা. সমীরণ মজুমদার], অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদেনীপুর

দিলীপ কুমার মিত্র (জানুয়ারি ১৯৯৬)। 'অ্যাব্সার্ড নাটক'। *অ্যাব্সার্ড নাটক* [সম্পা. সমীরণ মজুমদার], অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদেনীপুর

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০০৯)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*। আজকাল, ঢাকা

রামেন্দু মজুমদার [সম্পা] (ফেব্রুয়ারি : ২০০৭)। থিয়েটার বর্ষ এক। ঐতিহ্য, ঢাকা

সাঈদ আহমদ(জুলাই ১৯৭৬)। *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম [সম্পা.] (জুন ২০১১)। *বাংলাপিডিয়া* খণ্ড ৪। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

সুকুমার বিশ্বাস (মার্চ ১৯৯৮)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

হাসনাত আবদুল হাই [সম্পা.] (মে ২০১২)। *সাঈদ আহমদ রচনাবলি* ১ম খণ্ড। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Martin Esslin (1961). *The Theatre of the Absurd,* Anchor Books edition

পত্রিকাপঞ্জি

কবীর চৌধুরী (১৩৯৩)। 'আমাদের নাটকে নবতরঙ্গ'। *সুন্দরম*, ঢাকা

গিয়াস শামীম (২০১৫)। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক'। *শ্যামলিমা*, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মেহের নিগার (১৪০৫)। 'সাঈদ আহমদের নাটকে অ্যাবসার্ড ধর্ম'। *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শাহমান মৈশান (১৪২২)। 'সাঈদ আহমদের নাট্য নিরীক্ষা : অ্যাবসার্ড রূপকল্প, বাংলার মেটাফর, উদারনৈতিক মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের অন্বয়'। *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়